ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 459-466
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.033

তলস্তয়ের গল্প

মানস মজুমদার, *প্রফেসর (প্রাক্তন), বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Abstract

Leo Tolstoy was born on August 28, 1828, into an aristocratic landowning family in Russia. He was the owner of a vast estate and spent his early years in luxury and indulgence. However, as he grew older, he developed a growing disillusionment with wealth, status, and social prestige. Rejecting his aristocratic background, he aspired to become one with the common people of his country. He realized that true peace does not lie in material abundance but rather in love, sympathy, self-sacrifice, and service to others. Tolstoy had immense compassion for humanity. He felt deep pain for the suffering of the oppressed, impoverished, and downtrodden and stood beside them with a heart full of kindness. He was well acquainted with human nature—its morality, sins, greed, desires, and conflicts.

Tolstoy freely interacted with people from all classes of Russian society. The extravagance, vanity, and power-hungry tendencies of the aristocracy repelled him. In contrast, he found a profound sense of humanity among the common people, whose simplicity, mutual support, and faith in God reassured him. He believed that the world remains habitable because of the love, kindness, and wisdom of a few noble souls.

The 19th century was a golden age in Russian literature. During this period, great literary figures such as Pushkin (1799-1837), Dostoevsky (1821-1881), Chekhov (1860-1904), and Gorky (1868-1936) emerged. Among them, Tolstoy (1828-1910) stood at the pinnacle. Pushkin first gave voice to the pain and struggles of neglected and marginalized people in his stories. Gogol portrayed the plight of those crushed by a ruthless bureaucratic system. Chekhov, like a literary physician, sought to diagnose and cure the deep-seated social ills, envisioning social transformation. Gorky sang the songs of revolution, filling his tales with both turbulence and human love. But Tolstoy? He was incomparable. Recognized as one of the greatest novelists of all time, Tolstoy also enriched the realm of short stories, writing nearly fifty of them. His stories exhibit remarkable breadth, diversity, and depth.

Keyword: Leo Tolstoy, Russian Literature, Social Inequality, Russian Writers Pushkin, Dostoevsky.

মুচির কাজ করত সে। নাম সাইমন। বুটির দাম আগুন অথচ মজুরি সামান্যই। তাও সব সময় সবটা নগদে জোটে না। গ্রামের সাধারণ যত চাষাভূষো তার খদ্দের। অনেকটাই তাই বাকি পড়ে থাকে। কোনও রকমে দিন চালানো আর কী।

স্বামী-স্ত্রীতে ভাগাভাগি করে গায়ে দেয় শতেক তালি দেওয়া একটা মাত্র চামড়ার কোট। এদিকে শীত আসন্ন। যেভাবেই হোক, একটা কোট বানাতে হবে। সামান্য কিছু টাকা-পয়সা জমিয়েছে সে। চাষীদের কাছে পাওনা টাকাটা পেয়ে গেলে ভেড়ার একটা নতুন চামড়া কেনা যায়। আর তা হলে সাইমন ভাবে, নতুন একটা কোট বানিয়ে নিতে পারে সে।

বাড়ি থেকে বেরল সাইমন। বাকি পাওনার অতি সামান্য অংশই আদায় করতে পারল। আর জুটল মেরামতের জন্যে একজোড়া বুট। চামড়ার দোকানিও ধারে চামড়া বিক্রি করতে নারাজ হল। মনটা খারাপ হয়ে গেল সাইমনের। খানিকটা মদ খেয়ে ঘরমুখো হল। গির্জার কাছটিতে আসতেই দেখতে পেলো গির্জার গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে একটা মানুষ, গায়ে পোশাকের নামগন্ধও নেই। বেঁচে আছে কী মারা গেছে, তাও বোঝা দায়।

দরকার নেই ঝুট ঝামেলায় গিয়ে। সাইমন এগিয়ে চললো। কয়েক পা এগোতেই কিন্তু বিবেকের তাড়না বোধ করল সে। ফিরে এল লোকটার কাছে। দেখল, শীতে প্রায় জমে যেতে বসেছে লোকটা। অল্প বয়স, মুখের দিকে তাকালে মায়া হয়। নিজের পুরনো কোট আর মেরামতের জন্যে পাওয়া বুট জোড়াটা পরিয়ে, একটুখানি চাঙ্গা করে, তাকে নিয়ে বাড়িই ফিরল সাইমন।

অভাবের সংসার। স্ত্রী মাত্রোনা সাইমনের সঙ্গীটিকে দেখে প্রথমটা তো অসম্ভব চটে গেল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সব কথা শুনে আগন্তুকের জন্যে মমতা হল তার। খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করল। তাকে পরতে দিল সাইমনের পুরনো পোশাক।

লোকটার নাম মিখাইল। সাইমনের কাছেই থেকে গেল সে। কয়েকদিনের মধ্যেই রপ্ত করে ফেলল জুতো সেলাইয়ের কাজ। চমৎকার হাত তার। সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। সাইমনের অবস্থা ফিরে গেল।
দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা বছর। একদিন দামি চামড়া নিয়ে সেখানে এলেন এক বদমেজাজি ভদ্রলোক। তাঁর জন্যে মজবুত বুট জুতো বানিয়ে দিতে হবে। ভয়ে ভয়ে মাপ নিল সাইমন। মিখাইলকে বুট জোড়া বানানোর দায়িত্ব দিল সে।

মিখাইল কিন্তু বানাল একজোড়া চটি। সাইমন তো মিখাইলের কান্ড দেখে ঘাবড়ে গেল। ঠিক সেই সময় সেখানে এল ওই ভদ্রলোকের চাকরটি। বাড়ি ফেরার কালে মারা গেছেন ওই ভদ্রলোক। বুট জুতোর আর দরকার নেই। শবাধারে দেওয়ার জন্যে চাই চটি জুতো। মিখাইল তার হাতে চটি জোড়া তুলে দিল।

ছ বছরের মাথায় ছোট্ট দুটি মেয়েকে নিয়ে তাদের জুতো বানানোর জন্যে সেখানে এলেন এক ভদ্রমহিলা। মারিয়া। মেয়ে দুটির জন্মের দিন কয়েক আগে বাবা মারা গেছে। আর মাকে হারিয়েছে জন্মের দিনটিতে। কোনও সম্পর্ক না থাকলেও, অসহায় ওই মেয়ে দুটিকে দেখে দয়া হয় মারিয়ার। সন্তানস্নেহে তাদের লালন পালন করতে থাকেন।

মিখাইলের সারা দেহে ফুটে ওঠে অপরূপ জ্যোতি। সে জানায়, শাপগ্রস্ত, দেবদূত সে। কর্তব্যে অবহেলার জন্যে ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পৃথিবীতে মানুষের জীবন কাটিয়ে তিনটি সত্য জেনে আসতে। সেই তিনটি সত্য হল 'মানুষের কী আছে', 'মানুষের কী নেই', 'মানুষ কী নিয়ে বাঁচে।' সাইমন আর তার স্ত্রী যেদিন নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা-অভাব সত্ত্বেও ক্ষুধার্ত, শীতার্ত, মৃতপ্রায় মিখাইলকে আশ্রয় দিল, দিল খাদ্যপানীয় আর পোশাক, সেদিন মিখাইল প্রথম সত্যের সন্ধান পেল। 'মানুষের প্রেম আছে', জানল সে। দাম্ভিক বদমেজাজি ভদ্রলোকটি জানতেন না যে, তাঁর মৃত্যুলগ্ন আসন্ন। মিখাইল তাঁকে দেখে বুঝল, 'মানুষের আয়ু নেই।' আর মারিয়াকে দেখে সে জানল, 'মানুষ বাঁচে মানুষের জন্যে।' অভিশাপ-পর্ব শেষ। স্বর্গে ফিরে যায় স্বর্গের দেবদূত।

তলস্তয়ের একটি বিখ্যাত গল্প এটি। নাম 'মানুষ কী নিয়ে বাঁচে'। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তিপান্ন বছর বয়সে এ গল্প লেখেন তিনি। মানুষের জীবনের সত্যিকার সার্থকতাটুকু এ গল্পে তুলে ধরেন তলস্তয়।

রাশিয়ার অন্যতম এক অভিজাত পরিবারে বনেদি জমিদার বংশে জন্ম তলস্তয়ের (জন্ম ২৮ আগস্ট, ১৮২৮)। মস্ত বড় জমিদারির মালিক ছিলেন। প্রথম জীবন কেটেছে বিলাসে, ব্যসনে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ, প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সম্মান প্রভৃতির প্রতি ক্রমশই বিরাগ জেগেছে তাঁর। আভিজাত্যের পোশাকটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের আপনজন হতে চেয়েছেন। উপলব্ধি করেছেন, প্রাচুর্যের মধ্যে শান্তি নেই; ভোগ সুখের মধ্যে রয়েছে গ্লানি আর অবসাদ; মানুষের আয়ু সীমিত; অর্থহীন তার দম্ভ। মানুষের জীবন সার্থক হয়ে ওঠে, একের প্রতি অন্যের প্রেমে, সহানুভূতিতে: আত্মত্যাগ আর সেবার আদর্শই মানুষকে দিতে পারে শান্তি। মানুষের প্রতি মমতার অন্ত নেই তাঁর। বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, পীড়িত মানুষ জনের দুঃখ-দুর্দশায় তিনি ব্যথা পান; মমতা-স্নিগ্ধ অন্তর নিয়ে তাদের পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ান, তাদের ভালবাসেন, ভালবাসতে বলেন। মানুষের ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, কামনা-বাসনা ইত্যাদির সঙ্গে অপরিচয় ছিল না তাঁর। রাশিয়ার অভিজাত-অনভিজাত সমস্ত শ্রেণির মানুষের সঙ্গেই অবাধে মেলামেশা করেছেন তিনি। অভিজাত সমাজের জাঁকজমক আড়ম্বরপ্রিয়তা, বিত্ত প্রদর্শনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা, ক্ষমতা ও খ্যাতিলোলুপতা, ভড়ং-ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা আর দম্ভ তাঁকে আহত করেছে। তুলনায় বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের উজ্জ্বল প্রকাশ দেখেছেন তিনি। তাদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহযোগিতা, প্রেম ও ঈশ্বর নির্ভরতা আশ্বস্ত করেছে তাঁকে। মানুষের কাছে পৃথিবী যে আজও বাসযোগ্য, তলস্তয়ের ধারণা, তার মূলে আছে কিছু সংখ্যক মানুষের প্রেম, দয়া করুণা আর শুভবুদ্ধি।

রুশ কথা সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতক এক স্বর্ণযুগ। পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭), দস্তয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১), চেকভ (১৮৬০-১৯০৪), গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) প্রমুখ প্রতিভাবান কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে এ শতকে। সবার ওপরে আছেন তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০)। পরম মমতার সঙ্গে অবহেলিত উপেক্ষিত সাধারণ মানুষের ব্যথা-বেদনার কথা প্রথম শোনা গেল পুশকিনের গল্পে। গোগোল তাঁর গল্পে বললেন হৃদয়হীন আমলাতন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট শোষণক্লিষ্ট মানুষের কথা। সমাজের গভীরে যে দুরারোগ্য ব্যাধি জাঁকিয়ে বসেছে, চিকিৎসক-গল্পকার চেকভ তার মূলোচ্ছেদ করতে চাইলেন; সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন দেখলেন বিপ্লবের। গল্পে ঝোড়ো পাখির গান শোনালেন গোর্কি; সে ঝড় বিপ্লবের। তিক্ততার মধ্যেও মানব প্রেমে মুখর হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠ। আর তলস্তয়? তুলনাহীন তিনি। পৃথিবীর

চিরকালের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের একজন তলস্তয় গল্প সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছেন। প্রায় পঞ্চাশটির মত গল্প লিখেছেন তিনি। ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য ও গভীরতার স্বাদ পাওয়া যায় তাঁর গল্পগুচ্ছে।

একদা প্রথম জীবনে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-১৮৫৬) যোগ দিয়েছিলেন তলস্তয়। সে অভিজ্ঞতা যেমন মহাকাব্যোপম উপন্যাস 'যুদ্ধ ও শান্তি'-তে (১৮৬৪) ব্যবহার করেছেন তিনি, তেমনি কাজে লাগিয়েছেন 'সেবাস্তোপল-এর কাহিনিগুচ্ছ' তে (প্রথম অংশ রচিত হয় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন। শেষাংশ ২৭ ডিসেম্বর)। তলস্তয় ওই কাহিনিগুচ্ছের পাঠকদের নিয়ে যান আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা-সদনে, বীভৎস বিষণ্ণ এক পরিবেশে। পরিচয় করিয়ে দেন মানুষের তুলনাহীন যন্ত্রণা এবং বিস্ময়কর সহ্যশক্তির সঙ্গে। নিয়ে যান অত্যন্ত বিপজ্জনক চার নম্বর দুর্গে। পদে পদে যেখানে হাতছানি দিয়ে ডাকে মৃত্যুদূত; গোলাবারুদের গন্ধে বাতাস হয়ে ওঠে উত্তাল, স্বদেশপ্রাণ সৈনিকদের দুর্গরক্ষার সংকল্প হয়ে ওঠে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর। যুদ্ধক্ষেত্রে, সৈনিকদের ছাউনিতে নিয়ে যান তিনি। দেখান, মৃত্যুশঙ্কার মধ্যে পদোন্নতি ও বীরত্ব-পদক লাভের স্বপ্নে বিভোর সৈনিককে, দেখিয়ে দেন এক দেশের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও অনভিজাত বংশীয় সৈনিকদের প্রতি অভিজাত বংশীয় সৈনিকদের অবজ্ঞাটুকু। যুদ্ধের অনুপুঙ্খ ছবি আঁকেন তিনি। বীরত্ব, সাহস, দেশপ্রেম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, ঘৃণা, হতাশা, পাপ, অনুতাপ ইত্যাদি যে ছবিতে মূর্ত হয়ে ওঠে। আর শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন তোলেন তলস্তয়, কেন এই যুদ্ধ? যুদ্ধ তো নিছক একটা পাগলামি। বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন জীব হিসেবে মানুষের যে বড়াই তা কী তবে অর্থহীন নয়? শুভবুদ্ধির বড়ই অভাব মানুষের। কাহিনিগুলি পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডার। ফরাসি তর্জমায় সেগুলি পড়তে পড়তে সম্রাজ্ঞীর চোখের পাতা ভিজে উঠেছিল। রাতারাতি ছড়িয়ে পড়েছিল তলস্তয়ের সাহিত্যিক খ্যাতি।

শুভবুদ্ধির সঙ্গে অশুভবুদ্ধির দ্বন্দ্ব তাঁর একাধিক গল্পের উপজীব্য। এ ধরনের গল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'শয়তান' গল্পটি। তলস্তয়ের ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত এ গল্প। প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের কথা পরিণত বয়সে নানা সময়ে নানাভাবে অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি। মৃত্যুর তিন মাস আগেও গুণমুগ্ধ ভক্ত বিবুকভকে তিনি বলেছেন: 'আমার সম্বন্ধে সব সময় ভাল কথাই শুধু লেখো কেন? তা কি ঠিক? তাতে কি আমাকে সম্পূর্ণ জানা হল? মন্দ কথাগুলোও তো জানানো উচিত? আমার যৌবনে আমি খুব বাজে জীবন কাটিয়েছি, বিশেষ করে দুটি ব্যাপার এখনো আমাকে নাড়া দেয়। ... বিয়ের আগে আমাদের গ্রামের এক চাষী বউয়ের সঙ্গে একটা ব্যাপার ছিল আমার, যার উল্লেখ রয়েছে 'শয়তান' গল্পে। তারও আগে আমার পিসির এক পরিচারিকা মাশার সঙ্গে গড়ে ওঠে অবৈধ সম্পর্ক। মাশা ছিল কুমারী, আমি তার কুমারীত্ব নষ্ট করেছিলাম। চাকরি যায় তার, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।' 'শয়তান' গল্পটি সেই স্বীকারোক্তির অন্যতম এক দলিল। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর এ গল্প লেখেন তলস্তয়। গল্পের নায়ক এক জমিদার। ইউজেন তার নাম। বিয়ের আগে বিবাহিতা এক চাষি রমণী স্তেপানিদার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয় সে। এক সময় শিক্ষিতা শহুরে লিজাকে বিয়ে করে ইউজেন। স্তেপানিদার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখে না। লিজা তাকে সুখী জীবনের স্বাদ দেয়। বেশ কয়েকটি বছর কেটে যায় লিজার উষ্ণ সান্নিধ্যে। কিন্তু ভুলতে পারে না হাস্যলাস্যময়ী, জীবন চাঞ্চল্যে ভরপুর স্তেপানিদাকে। স্তেপানিদার প্রতি দুর্নিবার এক আকর্ষণ ক্রমশই প্রবল হয়ে ওঠে। আত্মসংযমের সমস্ত চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হয়, তখন আত্মহত্যা করে চিত্তজ্বালা থেকে চিরকালের জন্যে মুক্তি পায় ইউজেন। দ্বন্দক্ষত ইউজেন এ ভাবেই অশুভ বুদ্ধিকে প্রতিহত করে। তলস্তয়

বেঁচে থাকতে অবশ্যি এ গল্প প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর (মৃত্যু: ৭ নভেম্বর, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ) পর, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে।

চোদ্দ বছর বয়সে কাজান-এ পিসির বাড়িতে বেড়াতে যান তলস্তয়। এক বন্ধুর সঙ্গে নিষিদ্ধ পল্লিতে গেলেন। কিছু অভিজ্ঞতা হল। সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন 'বিলিয়ার্ড হিসাব রক্ষকের জবানি।' শুভ-অশুভ বোধের দ্বন্দে রক্তাক্ত চিত্ত নেখলয়ুদব এ গল্পের নায়ক। উচ্ছৃঙ্খল এই নায়কটি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে অনুশোচনা আর গ্লানির হাত থেকে রেহাই পায়।

'সের্গেইবাবা' (রচনা ১৮৯৮ খ্রিঃ, প্রকাশ মৃত্যুর পরে) ঋষি-প্রতিম এক মানুষের নৈতিক অধঃপতন ও অধঃপতন প্রতিরোধের প্রাণপণ প্রয়াসের কাহিনি। অভিজাত বংশীয়, সুদর্শন স্তেপান কাসাৎস্কি সংসার জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে প্রথম যৌবনে সন্ন্যাস নেয়। সেগেই তার সন্ন্যাস জীবনের নাম। একের পর এক অনেকগুলি মঠে ঈশ্বর-চিন্তায় কেটে যায় তার জীবনের অনেকগুলি বছর। উনপঞ্চাশ বছর বয়সে নির্জন মঠে গভীর রাতে ধনী-কন্যা, স্বভাব-চঞ্চল, ইন্দ্রিয়পরায়ণা সুন্দরী মাভকিনার আবির্ভাব ঘটল। সন্ন্যাসী সের্গেইকে প্রতারণা করাই তার উদ্দেশ্য। ছলনাময়ী মাকিনার সমস্ত ছলনাই কিন্তু সের্গেইয়ের কঠোর আত্মসংযমে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল। অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হল মাকিনা। তার জীবনে ঘটল বিরাট পরিবর্তন। সংসার ত্যাগ করল, বেছে নিল সন্ন্যাসিনীর জীবন। ঘটনাটি চাপা থাকল না। সের্গেইয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দূরে দুরান্তরে। লোকে তাকে জানল অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে। মঠ কর্তৃপক্ষ এই খ্যাতিকে অর্থাগমের কাজে ব্যবহার করতে লাগল। প্রতিদিন চারদিক থেকে নানা প্রলোভন হাতছানি দিতে লাগল সের্গেইকে। সের্গেইয়ের জীবন অশান্তিতে ভরে উঠল। গোপনে মঠ থেকে পালাল সে। চাষির পোশাকে তীর্থযাত্রীর মত গ্রামে-গঞ্জে ঘুরতে লাগল। অসংখ্য মানুষের দরজায় গেল সে। কেউ কেউ উপেক্ষা দেখালেও, অনেকেই দেখাল দয়া ও করুণা। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি সমস্ত রিপুকে জয় করল সে। এক সময় দেশের আইনরক্ষকদের বিচারে শাস্তি পেল সেগেছি। অপরাধ তীর্থযাত্রীর কোনও পাসপোর্ট ছিল না তার সঙ্গে। সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হল তাকে। সেখানে তার দিন কাটতে লাগল চাষির বাগানে কাজ করে, গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে, আর রোগীর সেবা শুশ্রূষা করে। ঈশ্বর-সেবার যথার্থ পথ খুঁজে পেল সে। তলস্তয় মনেপ্রাণে ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী। ঈশ্বর মঙ্গলময়, প্রেমময়, একথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন তিনি। কিন্তু ধর্মের নামে ভড়ং-ভণ্ডামি ছিল তাঁর অসহ্য। ঈশ্বর মঠে থাকেন না, সাধারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছেন তিনি। সাধারণ মানুষের সেবাই হল সত্যিকার ঈশ্বরসেবা, এই ছিল তাঁর ধারণা। এই ধারণার কথাই নানাভাবে তিনি শুনিয়েছেন 'সের্গেই বাবা', 'মানুষ কী নিয়ে বাঁচে', 'দুই তীর্থযাত্রী', 'যেখানে প্রেম, সেখানেই ঈশ্বর' প্রভৃতি গল্পে।

জেরুজালেম-পথিক দুই বন্ধুকে নিয়ে গড়ে উঠেছে 'দুই তীর্থযাত্রী' (১৮৮৫) গল্পটি। তলস্তয় বলেন, সত্যিকার তীর্থ পুণ্য ঘটে মানুষের সেবা আর কল্যাণে। ভক্তি এবং মানবতাবোধ হাত ধরাধরি করে চলেছে এ গল্পে। ভক্তি-বিশ্বাস লাভ করেছে নবতর তাৎপর্য।

'যেখানে প্রেম, সেখানেই ঈশ্বর' (১৮৮৫) গল্পের নায়ক এক মুচি। নাম: মার্তিন আভদিচ। খুবই গরিব সে। একতলার একটি ছোট্ট ঘরে বসে জুতো বানায় সে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দেখতে পায় পথ-চলতি মানুষের পা। রাতের বেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে বেশ কিছুক্ষণ বাইবেল পড়ে মার্তিন। অভ্যাস মত এক শীতের রাতে সে পড়ছিল বাইবেল। সে রাতে পড়ছিল বাইবেলের একটি বিশেষ অংশ, সেন্ট লুকের

সপ্তম অধ্যায়। সেখানে খ্রিস্ট ধনী ফারিসিকে বলছেন, ধনীর কাছে যান না তিনি, গরিবেরাই তাঁর প্রিয়। কেন না তারাই অকাতরে তাঁকে সব কিছু দিতে পারে। পড়তে পড়তে চোখে ঘুম নেমে আসে মার্তিনের। হঠাৎ যেন কার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে সে, 'মার্তিন, কাল সকালে তোমার কাছে আসবো আমি। রাস্তা পানে নজর রেখো।' চঞ্চল হয়ে ওঠে মার্তিন। সকাল থেকে ব্যাকুল চিত্তে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আসে এক বুড়ো সৈনিক। স্তেপানোভিচ্। রাস্তার বরফ পরিষ্কার করে করে যে ক্লান্ত আর অবসন্ন। মার্তিন তাকে গরম চা দেয়, ছোট্ট ঘরটিতে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিতে বলে। স্তেপানোভিচ্ চলে যায়। শিশুকোলে এক দীন দুঃখিনী মাকে দেখতে পায় মার্তিন। ডাক দেয় তাকে। দেয় রুটি আর গরম চা। ঠান্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে দেয় পুরনো পোশাক। শিশুকে নিয়ে চলে যায় মা-টি। এমন সময় চোখে পড়ে, এক ফলওয়ালি পুলিশের হাতে তুলে দিতে চলেছে রাস্তার একটি ছেলেকে। ছেলেটির অপরাধ, ক্ষিধের জ্বালায় সে ওই ফলওয়ালির ঝুড়ি থেকে আপেল চুরি করেছে। খ্রিস্টের ক্ষমা করুণার বাণী শুনিয়ে ফলওয়ালি আর ছেলেটির মনের পরিবর্তন ঘটায় মার্তিন। এরপর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় সমস্ত দিনটা কেটে যায় তার। কিন্তু খ্রিস্ট তো আসেন না। রাতের বেলা আবার বাইবেলের পাতা খোলে মার্তিন। ঘরের কোণ থেকে কে যেন ডাক দেয় 'মার্তিন।' 'কে-কে তুমি?' চমকে ওঠে মার্তিন। উত্তর আসে 'আমি।' তারপর একে একে তার সামনে দিয়ে মৃদু হেসে চলে যায় সকালবেলার সেই অতিথিরা স্তেপানোভিচ্, শিশুকোলে দীনদুঃখিনী মা, ফলওয়ালি ও রাস্তার ছেলেটি। বাইবেলের খোলা পাতাটির দিকে চোখ যায় মার্তিনের। দেখে, সেখানে লেখা রয়েছে, আমার ক্ষিধে পেয়েছিল, তুমি আমাকে খাবার দিয়েছ; আমার তেষ্টা পেয়েছিল, তুমি আমার তেষ্টা মিটিয়েছ। আমার মত অচেনাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ।' পাতা উল্টে যায়। মার্তিন পড়ে, 'আমার ভাইয়েদের জন্যে যা করেছ তা তো আসলে করেছ আমারই জন্যে।' ঈশ্বরকে পেতে চাও? দুস্থ মানুষের সেবা করো। একথাই বলতে চান তলস্তয়। অনেক অনেকদিন আগে এমনি কথাই শুনিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ (তাঁর জীবনবাণীর সঙ্গের পরিচয় ছিল তলস্তয়ের)। তলস্তয় সমকালীন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এবং পরবর্তীকালের গান্ধীজিও (১৮৬৯-১৯৪৮) বলেছেন ওই ধরনের কথা।

লোভ হল মানুষের এক বড় শত্রু। লোভ জয় করতে বলেন তলস্তয়। 'মানুষের কতখানি জমি দরকার' (১৮৮৬) নামক গল্পে লোভের মর্মান্তিক পরিণামটি দেখিয়ে দেন। গল্পটি এক চাষিকে নিয়ে। পাখোম তার নাম। সামান্য কিছু জমি ছিল তার। একদিন সে তার স্ত্রীকে বলল: 'আরও যদি কিছুটা জমি পেতাম, তাহলে কাকেও তোয়াক্কা করতাম না, এমনকি শয়তানকেও না।' শয়তানের কানে গেল কথাগুলো। অল্পদিনের মধ্যেই পাখোমকে আরও খানিকটা জমি পাইয়ে দিল শয়তান। যে জমি পাখোমের হাতে এল, তাতে খাওয়া-পরার ভাবনা থাকে না। দিব্যি চলে যায়। পাখোমের মনে কিন্তু শান্তি নেই। তার লোভ বেড়ে গেল। অনেক-অনেক জমি চাই তার। মস্ত বড়লোক হতে হবে তাকে। শয়তানের কারসাজিতে পুরনো জমি-জায়গা মোটা দামে বেচে নতুন জায়গায় গিয়ে কম দামে অনেক জমি কেনে সে। কিন্তু তাতেও তার জমির ক্ষিধে মেটে না। আরও জমি চাই, আরও অনেক জমি। সে শুনতে পায়, বাসাকিরদের দেশে খুব সস্তায় পাওয়া যায় অঢেল ভাল জমি। সোনা ফলানো যায় তাতে। ছুটে যায় সে। বাসকিররা তাকে জমি দিতে রাজি হয়। শর্ত হয়, একটি বিশেষ স্থান থেকে রওনা দিয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে যতখানি জমি সে পায়ে হেঁটে ওই বিশেষ স্থানটিতে ফিরে আসতে পারবে ততোখানি, জমিরই মালিক হবে সে। লোভে চকচক করে ওঠে পাখোমের চোখ দুটো। যথা সময়ে সে ছুটতে শুরু করে। জোরে জোর অনেক জোরে। অনেক অনেক জমির

মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। দিন শেষ হয়ে আসে। যাত্রা শুরুর স্থানটিতে ফিরতে থাকে সে। একসময় ফিরেও আসে। কিন্তু ক্লান্ত অবসন্ন পাখোম মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়। মারা যায় পাখোম। সেখানেই কবর দেওয়া হয় তাকে। আর এজন্যে মাত্র সাড়ে সাত হাত জমির দরকার হয়।

তলস্তয় তাঁর রূপক-গল্পের মাধ্যমে এভাবেই আমাদের সতর্ক করে দেন। অসংখ্য পাংখানকে অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চান।

লোভের আর এক ছবি পাই 'মনিব ও চাকর' গল্পে। সস্তায় একটি বড় জঙ্গল কেনার জন্যে বরফ ঝড়কে তোয়াক্কা না করে রাস্তায় বের হয়েছিলো ভাসিলি। বিত্তবান সে। কিন্তু তার প্রচন্ড লোভ তাকে আরও বিত্তের কাঙাল করে তুলল। বরফ ঝড়ে রাস্তা হারাল ভাসিলি। রাস্তার মাঝখানটিতেই মৃত্যু ঘটল তার। অথচ আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেল নিকিতা, তার বিশ্বস্ত ভূতটি, যে বহু কষ্ট সহ্য করেও প্রভুকে আরাম দিতে চেয়েছে, বাঁচাতে চেয়েছে। তার সেবা আর মমতাই রক্ষা করল তাকে।

কিন্তু লোভ তো শুধু জমি আর জঙ্গলের জন্যেই নয়। সুন্দরী পরস্ত্রীর প্রতি লোভের পরিণামও দেখিয়েছেন তলস্তয়। ভল্গা অঞ্চলে প্রচলিত একটি লোককথা অবলম্বনে রচিত 'ফাঁকা ঢাক' (১৮৯১) তার উদাহরণ। মজুর এমেল্যানের রূপসী স্ত্রীকে দেখে লোভ হয়েছিল রাজামশায়ের। ছলে বলে কৌশলে রাজামশায় তাকে লাভ করতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁকে কী নাকালটাই না হতে হল।

লাঞ্ছিত উৎপীড়িত গরিব দুঃখী মানুষের জন্যে অপার মমতা তলস্তয়ের। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষেরা তাই তাঁর গল্পগুচ্ছের আঙিনায় বারংবার এসে দাঁড়ায়। কৃষককুলের দুঃখ দুর্দশাও ব্যথিত করেছে তাঁকে। নিজে জমিদার হয়েও তাই জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহী হয়েছেন। বারংবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, তাঁর সমস্ত জমিজমা তাঁর গরিব চাষি প্রজাদের বিলিয়ে দেবেন। কিন্তু নিকট পরিজনের বিরোধিতায় সে ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি তাঁর। চেয়েছেন গরিব চাষির মত সাদাসিধে জীবন যাপন করতে। রাশিয়ায় এক সময় ভূমিদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। বংশ-পরম্পরায় ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করতে হত তাদের। ওই প্রথার বিরুদ্ধে তাই ক্রমশ বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। পুশকিন ও তলস্তয়ের মত আরও অনেকেই সোচ্চার হয়ে ওঠেন। 'পলিকুশকা'-র (১৮৬২) মত গল্পে পাই সেই প্রতিবাদপ্রবণতার পরিচয়। গল্পটি ভূমিদাস প্রথার ভয়াবহতার একটি মূল্যবান দলিল হিসেবেই বিবেচিত হবে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে অবশ্যি আইন করে ভূমিদাস প্রথা তুলে দেওয়া হয়।

'বল নাচের পরে' (১৯০৩) গল্পে আর এক ধরনের নৃশংস অত্যাচারের ছবি এঁকেছেন তিনি। দুটি সৈন্য আড়াআড়ি ভাবে ধরে রয়েছে একটি বন্দুক। তার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে এক তাতারকে। কোমর পর্যন্ত কোনও পোশাক নেই তার। গলা বরফের ওপর দিয়ে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে একদল সৈনিক। আর দুপাশ থেকে অনবরত তার ওপর হচ্ছে ঘুষিবৃষ্টি। রক্ত ঝরছে তার শরীরে। টলছে তার পা দুটো। তার দয়া প্রার্থনায় কেউ কান দিচ্ছে না। অপরাধী (অপরাধ সামান্যই) ওই তাতারের ওপর নৃশংস অত্যাচারের নির্দেশ দিচ্ছে যে কর্নেলটি তারই সুন্দরী কন্যার প্রেমে পড়েছিল আইভান ভাসিয়েভিচ। ওই নিষ্ঠুর দৃশ্যে সে এত বিচলিত হয়ে পড়ে যে, কর্নেল-কন্যার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কটিই চুকিয়ে দেয়।

তলস্তয়ের কোনও কোনও গল্প আকারে বেশ বড়। যেমন, 'দুই হুজুর' (১৮৫৬), 'আইভান ইলয়ি এর মৃত্যু' (১৮৮৬), 'শয়তান' (১৮৮৯), 'সেগেইবাবা' (১৮৯৮) প্রভৃতি গল্প। এগুলি নভেলা জাতীয়। আবার

'চীনামাটির পুতুল' (রচনা ১৮৬৩; প্রকাশ মৃত্যুর পরে), 'ভালুক শিকার' (১৮৭২), 'ঈশ্বর সত্যদ্রষ্টা কিন্তু অপেক্ষাপ্রবণ' (১৮৭২), 'ইলিয়াস' (১৮৮৬)', 'তিন সাধু' (১৮৮৬), 'অনুতপ্ত পাপী' (১৮৮৬), 'ক্রীসাস ও সোলন' (১৮৮৬), 'ফাঁকা ঢাক' (১৮৯১), 'আসিরিয়ার রাজা এসারইডাদ্দন' (১৯০৩), 'কাজ, মৃত্যু ও ব্যাধি' (১৯০৩), 'তিনটি প্রশ্ন' (১৯০৩), 'আলেশা ভাঁড়' (রচনা ১৯০৬ প্রকাশ ১৯১১) প্রভৃতি ছোট আকারের গল্পও লিখেছেন তিনি। সার্থক ছোটগল্প হিসেবে অবশ্য 'মানুষ কী নিয়ে বাঁচে' (১৮৮১), 'দুই তীর্থযাত্রী' (১৮৮৫), 'যেখানে প্রেম, সেখানেই ঈশ্বর' (১৮৮৫), 'মানুষের কতখানি জমি দরকার' (১৮৮৬) ইত্যাদি গল্প বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পে পাই লোককথার ঢঙে। উত্তম পুরুষের জবানিতে যেমন গল্প শুনিয়েছেন তিনি, তেমনি শুনিয়েছেন প্রথম পুরুষের জবানিতে। ডায়েরির ধরনটিও কোনও কোনও গল্পে দেখা যায়। সন্দেহ নেই, গল্প-কথনে তিনি রীতি-বৈচিত্র্যের সাহায্য নিয়েছেন।

গল্পকার তলস্তয় উদ্দেশ্যপ্রবণ। বিশেষ কোনও বক্তব্য প্রতিপাদনই তাঁর অভিপ্রায়। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যে কলম ধরেননি তিনি। মানুষের মঙ্গল-কল্যাণের সঙ্গে যোগ আছে এমন কোনও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তুই তাঁর গল্পের উপজীব্য। মানুষের আত্মাকে স্পর্শ করতে চান তিনি। সন্দেহ নেই, তলস্তয় নীতিবাদী। কিন্তু সেই নীতিবাদ প্রায়শই জাতশিল্পীর কলমে হয়ে উঠেছে অপূর্ব শিল্পশ্রীমণ্ডিত। বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে তাঁর গল্প।

মানুষকে ভালবাসেন তিনি। মানুষের কল্যাণ চান। অত্যাচার নয়, উৎপীড়ন নয়, মানুষ মানুষকে ভালবাসুক, এটাই কাম্য তাঁর। মানুষের স্থূল বস্তুগত উন্নতিটুকুই তাঁর কাম্য নয়, আধ্যাত্মিক উন্নতিও ঘটাতে চান তিনি। যুগপৎ ব্যক্তি ও সমষ্টির ক্ষণিক ও চিরন্তন উন্নতি তাঁর লক্ষ্য। আর এজন্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষপাতী তিনি স্বার্থজর্জর মানুষের কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, দম্ভ ও কপটতার কথা ভুলে যাননি তলস্তয়। কিন্তু আস্থা হারাননি মানুষের শুভবুদ্ধিতে। মানুষ এগিয়ে যাবে, এ বিশ্বাস ছিল তাঁর। ভবিষ্যতের এক মহৎ, উজ্জ্বল, শোষণহীন, সুখী ও সমৃদ্ধ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন তলস্তয়। সেই স্বপ্নেরই স্বর্ণফসল তাঁর গল্পগুচ্ছ।